

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অন্নদাশঙ্কর রায় : পত্রাবলির আলোকে

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল আহসান চৌধুরী
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.12
Pages	১৭১-১৯০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অন্নদাশঙ্কর রায় : পত্রাবলির আলোকে

আবুল আহসান চৌধুরী*

সার-সংক্ষেপ : আমার কোনো কোনো চিঠি বন্ধুজনের নির্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে চিঠিরও সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে। তেমনি ভয়ও জেগেছে যে আমার যে সব চিঠি ছাপবার মতো করে লেখা নয়, ফুর্তি করে লেখা সে সব চিঠিও একদিন ছাপার হরফে উঠতে পারে। এখন চিঠি লিখতে বসলে অমনি সতর্ক হই, পাছে এমন কিছু লিখি যা ছাপার হরফে ধরা পড়লে আমাকে সুদ্ধ ধরা পড়িয়ে দেবে। পাঠকরা ভাববেন, "কই, এঁর বই পড়ে যেমন মনে হয় চিঠি পড়ে তো তেমন হয় না।" এতদিনের সাধনায় আমার যে সাহিত্যিক রূপটি দেশের পাঠকদের চোখে পরিচিত হয়ে এসেছে একখানি চিঠি তাকে একদিনেই ধুলিসাৎ করতে পারে। অতএব শতং বদ মা লিখ।

–৭৫ বছর আগে চিঠি-লেখা সম্পর্কে এই বক্তব্য পেশ করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) 'চিঠির কথা' নামে এক নিবন্ধে। ১৯৪১ সালে লেখা এই নিবন্ধটি প্রথমে *জীয়নকাটি* (১৯৪৯), পরে তাঁর *সাহিত্যিকের জবানবন্দী* (১৯৯৬) বইয়ে সংকলিত হয়। এই লেখায় চিঠিপত্র সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের ভাবনাটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। চিঠি পাওয়ার আনন্দ, চিঠি লেখার উৎসাহ-আলস্য-সতর্কতা, চিঠির রকমফের, সাহিত্যিকের চিঠি লেখার সমস্যা– এইসব বিষয় নিয়ে তিনি খোলা মনে তাঁর নিজের মতামত অকপটে তুলে ধরেছেন 'চিঠির কথা'য়।

দুই

অন্নদাশঙ্কর তাঁর ৯৮ বছরের দীর্ঘজীবনে অজস্র চিঠি লিখেছেন নানাজনকে নানা প্রয়োজনে। এর একদিকে যেমন রয়েছে পেশাগত জীবনে দাপ্তরিক কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনের চিঠিপত্র, সৌজন্যসূচক জবাবি চিঠি,– অপরদিকে তেমনি আছে কোনো বিষয়ে নিজের মতামত জানিয়ে লেখা চিঠি– সেসব চিঠি আবার কখনো বিতর্কমূলকও বলেছেন তিনি : 'চিঠি লিখতে বসলে আমি হয় ভদ্রলোক নয় ভাবুক।' কেজো বা দরকারি চিঠি বাদ দিলে তাঁর চিঠিগুলো মূলত সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য-রাজনীতি

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে লিখিত। তবে এই জাতীয় চিঠিপত্রের মধ্যে দেশ ও সমাজের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। এর ভেতর দিয়ে সমাজমনস্ক অন্নদাশঙ্করকে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। অনেক চিঠিরই জন্ম – তাঁর ভাষায়– 'তর্কের ঝোঁক' ও 'মত জাহির করার' মানসিকতা থেকে।

পত্র-লেখক যদি সাহিত্যিক হন তা হলে তাঁর নিজের নামের প্রতি সুবিচারের প্রয়োজনে পত্র-রচনায় তাঁকে যথেষ্ট সতর্ক ও সচেতন থাকতে হয়। এ-বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট :

> সাহিত্য রচনার একটি উৎকর্ষমান আছে, সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার একটা প্রয়াস আছে, সে প্রয়াস তো চিঠির বেলায় স্থগিত রাখতে পারিনে। দরকারী বা সরকারী চিঠি হলে অন্য কথা, কিন্তু যে চিঠি কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা হয়েছে তা সাহিত্যের স্বজাতি, কেননা সাহিত্যও কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা। তা হলে সাহিত্যের মান চিঠির উপরও আরোপিত হয়, চিঠিও হয়ে ওঠে সাহিত্য।

এই কথার রেশ ধরে তিনি আবার বলেছেন :

> যদি আমি রবীন্দ্রনাথ হতুম তবে যাই লিখতুম তাই হতো উৎকৃষ্ট, কিন্তু আজ যা লিখি কাল তা পছন্দ হয় না। সেইজন্যে আমার চিঠি যেদিন লেখা হয় সেদিন ডাকে না গেলে পরদিন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে যায়। যাঁরা আমার চিঠি পান তাঁরা জানেন না যে হয় ও চিঠি কোনমতে ডাকঘরে গিয়ে জান বাঁচিয়েছে, নয় ওর বহু জন্ম অতীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে চিঠি হয়তো আমার মনের মতো হয়নি। কী করি, একেবারে জবাব না দিয়ে তো পারিনে।

অন্নদাশঙ্কর চিঠির জবাবদানের ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক, নিয়মনিষ্ঠ ও সৌজন্যপরায়ণ। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আদর্শ। যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন : 'আমাকে চিঠি লিখলে আমি তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত নিরুত্তর থাকি।' তাঁর এই বক্তব্যকে নিছকই রহস্য করে বলা কথার কথা হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। কেননা চিঠি লিখে তাঁর কাছ থেকে কেউ জবাব পাননি এমন ঘটনা বিরল– এই ভূমিকা-লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এ-কথা অনায়াসেই বলা চলে।

তিন

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা লেখক হিসেবে আবির্ভাবেই চমক লাগিয়ে স্বীকৃতি-সমীহ আদায় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম মনে না পড়ে উপায় নেই। আরও একটি ব্যাপারে তাঁর কথা বলতেই হয়, এমন লেখকের সংখ্যাও বেশি নয় যাঁরা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই সমান দক্ষতা নিয়ে বিচরণ করেছেন। আর অন্তত এই

দৃষ্টান্তও বিরল যে বাংলা-ওড়িয়া-ইংরেজি এই তিন ভাষাতেই তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন। লেখার জন্যে অকালে পেশা-ত্যাগ– এমন উদাহরণও অতি দুর্লভ। মুক্ত মন, উদার দৃষ্টি, স্বচ্ছ ধারণা, স্পষ্ট ভাষণ, ঐতিহ্যপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা– তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে এক ভিন্ন ধাঁচে গড়ে তুলেছে। তিনি সমর্পিত ছিলেন সত্য-সুন্দর-কল্যাণ-আনন্দের চেতনায়।

উৎকলের এক প্রবাসী বাঙালি-পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর জীবনে নাটকীয়তার ব্যাপার কম নেই। অল্পদিনের পরিচয়ে প্রেম, তারপর চটজলদি বিয়ে করেন সেই বিদেশিনি অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফকে – নাম দেন লীলা, যিনি হয়ে ওঠেন তাঁর শিল্প-সহচরী – বেশে-ভাষায়-মূল্যবোধ-রুচিতে হয়ে ওঠেন পুরোদস্তুর বাঙালি। তাঁকে নিয়ে ঘুরেছেন তামাম বাংলা মুলুক। দেশভাগের আগেই বাংলার পূর্বাংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রচিত হয় কর্মের সূত্রে। ধীরে ধীরে এই সম্পর্ক গভীর হয় – এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের প্রতি এক আত্মিক টান অনুভব করেন। এর ফলে একসময় গভীর আবেগ-অনুরাগ-আকর্ষণে বলেছিলেন : 'আমার শেষজীবন কাটাতে চাই কুষ্টিয়ায়, বাংলাদেশের হৃদয় যেখানে'। কিন্তু বাদ সাধলো দেশভাগ। তবুও বন্ধনের সুতো ছিঁড়ে যায়নি কখনো। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সমর্থক। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম তাঁর মনে নতুন করে আবার আশা জাগায়। ছিলেন প্রবলভাবে বাংলাদেশপ্রেমী, আন্তরিক অনুরাগী ছিলেন বাংলাদেশের মানুষ ও সাহিত্যের।

চার

কোনো মানুষকে অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিমভাবে চেনা-জানা-বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় তাঁর চিঠিপত্র। স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীর চাইতেও চিঠিপত্রের সাক্ষ্য বেশি নির্ভরযোগ্য। এখানে সংকলিত অন্নদাশঙ্করের লেখা পনেরোটি চিঠি সম্পর্কেও এ-কথা সত্য। সবগুলো চিঠিরই প্রাপক সুরজিৎ দাশগুপ্ত (জ. ২০ এপ্রিল ১৯৩৪)। এর মধ্যে একটি চিঠি সুরজিৎ ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দাশগুপ্তের (জ. ১৯৩৮) যৌথনামে লেখা। মঞ্জুর কথা অন্য কোনো কোনো চিঠিতেও আছে; সুরজিতের সমান স্নেহ পেয়েছেন অন্নদাশঙ্করের কাছ থেকে। পেশায় শিক্ষিকা মঞ্জু; পড়িয়েছেন বেশ কয়েকটি নামি প্রতিষ্ঠানে, যেমন– দার্জিলিং ও কলকাতার লরেটো কলেজ, কলকাতার বাসন্তী দেবী কলেজ, নারকেলডাঙ্গা গুরুদাস কলেজ, বোম্বের সোফিয়া কলেজ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেকদিন থেকেই লেখালেখি করছেন, তবে স্মৃতিচর্চার বই 'When Your Granny Was A Little Girl' বেরুলো মাত্র এই বছর, ২০১৩-তে। সাহিত্যবোদ্ধা সুরজিতের পরিচয় কবি-কথাশিল্পী-প্রাবন্ধিক-শিশুসাহিত্যিক-সাংবাদিক-সাময়িকপত্র-সম্পাদক চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে। নানা পেশার মানুষের– বিশেষ করে তাঁর সময়ের লেখকদের সঙ্গে চিঠিপত্রে আলাপ-পরিচয় গড়ে তোলায় খুব আগ্রহী ছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে জীবনানন্দ দাশ, ধীরাজ ভট্টাচার্য থেকে

প্রেমেন্দ্র মিত্র– কার সঙ্গে না তাঁর চিঠি-চালাচালি চলতো! বলা চলে, পত্র-যোগাযোগ ছিল তাঁর প্রধান শখ। এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের প্রয়াণের ফলে এককালে পত্রপ্রাপ্তির শিহরণজাগানো অনুভূতি বলতে গেলে অনেকটাই তাঁর স্মৃতির অন্তর্গত।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের খুব কাছের মানুষ। তাই লেখকজীবনের প্রায় শুরুতেই সুরজিৎ শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাঁর উপন্যাস 'দিনরাত্রি' (১৯৫৬) উৎসর্গ করেন অন্নদাশঙ্করকে। আর স্নেহের সুরজিৎ পান অন্নদাশঙ্করের 'বাংলার রেনেসাঁস' (১৯৭৪) বইখানা। সুরজিৎ অন্নদাশঙ্করের বেশকিছু বইয়ের আলোচনাও করেন নানা পত্র-পত্রিকায়। আর অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন সুরজিতের বই 'দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৭)-এর এক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পরের বছর (১৯৬৮) 'জয়শ্রী' পত্রিকায়। পরে এই আলোচনাটি অন্নদাশঙ্করের কোনো কোনো বইয়েও স্থান পায়।

চিঠিপত্রে প্রথম আলাপ ১৯৪৯-এ, মুখোমুখি দেখা ১৯৫১-এর মে কী জুন মাসে। তারপর সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে– অর্ধশতকেরও বেশি সময়ের এই সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন হয় ২০০২-এ, অন্নদাশঙ্করের মৃত্যুতে। সুরজিৎ রায়-পরিবারের একজন প্রিয় সদস্য হিসেবেই গৃহীত হয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর নানা বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন এবং পরামর্শও নিতেন– সুরজিতের সাহিত্য-বিবেচনাকে তিনি বিশেষ গুরুত্বও দিতেন। অন্নদাশঙ্করের বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি, প্রকাশনার ব্যবস্থা, প্রুফ দেখা এসব কাজ তো সুরজিৎ সানন্দেই করতেন, আর তাতে অন্নদাশঙ্কর অনেকটাই নির্ভার ও নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাঁর লেখা বা বই প্রকাশের বিষয়ে সুরজিতের মতামত নিতেন বেশির ভাগ সময়েই– লেখা ঝাড়াই-বাছাই, এমনকী বইয়ের কী নাম হবে, তাতেও সুরজিতের পরামর্শ কাজে লাগতো। সুরজিৎকে লেখা অন্নদাশঙ্করের চিঠি থেকে এসব কথা বেশ জানা যায়– সেইসঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরিমাপও। চিঠির সংখ্যা দিয়েও তা বোঝা যায়। সবমিলিয়ে অন্নদাশঙ্কর প্রায় হাজারখানেক চিঠি তাঁকে লিখেছিলেন বলে সুরজিতের আন্দাজ। প্রথম দিককার অনেক চিঠি বেনোজলে ভেসে গেলেও এখনো সযত্নে রক্ষিত যত চিঠি, তার সংখ্যাও কম নয়। কোনো তথ্য-পরিসংখ্যান ঠিক ঠিক জানা নেই, তবে অনুমান করা চলে সুরজিৎই বোধহয় অন্নদাশঙ্করের সবচেয়ে বেশি চিঠির প্রাপক।

পাঁচ

এখানে সংকলিত অন্নদাশঙ্করের চিঠিগুলো মোটের ওপর বক্তব্যপ্রধান। কোনো কোনোটি তো হ্রস্ব কলেবরের পত্র-প্রবন্ধ যেন। এসব চিঠিতে অন্নদাশঙ্করের মন-মত-মর্জি-মেজাজের পরিচয় মেলে। কখনো নিজের সাহিত্যভাবনা, লেখার ধরনধারণ, মনোদ্বন্দ্ব, কখনো অনুজ সাহিত্যসেবীদের রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ এবং

কখনো সামাজিক-রাজনৈতিক বা অন্য কোনো বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তর্কের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। তাঁর জীবনঅন্বেষা, সমাজচিন্তা ও সাহিত্যভাবনার স্মারক এই চিঠিগুলো। চিঠিতে তাঁর টুকরো কিছু মন্তব্য যেন সুভাষণ-প্রবচনের মর্যাদা লাভের যোগ্য– এখানে সেসবের সামান্য দু-চারটে পেশ করলে তাঁর চিন্তার গভীরতা, যুক্তির কৌশল ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় মিলবে :

১. আমার নিজের কাজ হলো সাহিত্যের কাজ। আমি রসের সাগরে তলিয়ে যেতে চাই, তুলে আনতে চাই এমন কিছু যা আমার অথচ সকলের আমার হাত দিয়ে সকলের (৭.৭.৫১)।

২. বিপ্লব ঘটে যখন অগ্রসর হওয়ার আর সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় (২৫.১.৫২)।

৩. কবিতার উপর টান আমার বাল্যকাল থেকেই। একদিন আমি কবি ছিলুম। এখন যে কেউ আমাকে কবির পর্যায়ে ফেলে না, বড় জোর ছড়ার জন্যে স্মরণ করে, এটা আমার জীবনের অন্যতম আফসোস (২৪.১০.১৯৫৪)।

৪. সাহিত্য সম্বন্ধে যিনিই যাই বলুন না কেন মতভেদের অবকাশ থাকবেই। এ তো বিজ্ঞান নয় গণিত নয় যে সকলে একমত হতে বাধ্য। এর মূল্য সর্বজনের স্বীকৃতিতে নয়, এর মূল্য আমার অভিজ্ঞতার যাথার্থ্যে, আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তায় (২৫.১.৫৫)।

৫. বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভেবে দেখেছি, তাঁকে liberal বলা চলে না, কিন্তু humanist বলা চলে (১৫.৬.১৯৫৫)।

৬. দেশ রসাতলে গেলেও আমি রসের অতলে ডুবে থাকব, রস পান করে ও করিয়ে আমার সার্থকতা ও সিদ্ধি (২৯.১১.৫৮)।

৭. বইখানিতে [শঙ্করের 'চৌরঙ্গী'] অনেকগুলি মুখ, কিন্তু মুখের পেছনে যে মন সে মন একটুখানি ঘোমটা সরায় শুধু। অল্পই তার দেখতে পাই। তারপর আবার ঘোমটা দেয়। একজন মানুষের পক্ষে অতগুলি মনের অন্তরঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়। শঙ্কর অন্তরঙ্গ হতে সময় পান নি। বোধহয় দুরাশা বলে চেষ্টাই করেন নি (২৩.১০.১৯৬২)।

৮. কোনো ক্ষতিই ক্ষতি নয় যদি তার থেকে লাভ উঠিয়ে নেয়ার কৌশল জানা থাকে (২৪.১.৬৪)।

৯. যা right তারই জয় হবে (২৪.১.৬৪)।

ছয়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতের লেখা এমনিতেই দুষ্পাঠ্য, শেষজীবনে তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। তাঁর হস্তলিপি থেকে পাঠনির্ণয় যথেষ্ট সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার, অনেকাংশে দুরূহও বটে। দু-এক জায়গায় যেখানে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, সেই ছাড়ের

জায়গায় বন্ধনীর মধ্যে [...] চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। চিঠিগুলো কালক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় সুরজিৎ দাশগুপ্তের সৌজন্যে এই পত্রগুচ্ছ ছাপার সুযোগ মিললো– তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আশাকরি এক অসামান্য বাঙালি সৃজনশিল্পী ও মননচিন্তকের সঙ্গে পাঠকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটবে এই পত্রালির ভেতর দিয়ে।

আবুল আহসান চৌধুরী

পত্রাবলি

পত্র : ১

শান্তিনিকেতন
৭.৭.৫১

কল্যাণীয়েষু,

আমি কলকাতা ছেড়েছি এক মাস আগে। এখনো এখানে ভালো করে গুছিয়ে বসতে পারিনি। তুমি কলকাতায় আমার খোঁজ করেছিলে কিন্তু দেখা পেলে না শুনে দুঃখিত হলুম। আসছে বারে কখনো কোথাও দেখা হবে।

"প্রত্যয়" নামে যে প্রবন্ধগুলিকে একত্র করা হয়েছে সেগুলি গান্ধীজীর মৃত্যুর পর গান্ধীকৃত্য হিসাবে লেখা। তাঁর কাজ তিনি অসমাপ্ত রেখে গেলেন, সে কাজ আমাদের সকলের কিছু কিছু করা উচিত, এই ঔচিত্যবোধ থেকে সেগুলি লেখা হয়েছে। কিন্তু কত কাল এ কাজ আমি করতে পারি! এ তো আমার নিজের কাজ বা স্বধর্ম নয়। আমার নিজের কাজ হলো সাহিত্যের কাজ। আমি রসের সাগরে তলিয়ে যেতে চাই, তুলে আনতে চাই এমন কিছু যা আমার অথচ সকলের। আমার হাত দিয়ে সকলের। সুতরাং "প্রত্যয়" ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। গান্ধীজীর কাজ আমার দ্বারা ঐটুকুই হলো। এর পরে অনেকে আমাকে বলেছেন গান্ধীচরিত লিখতে। পারব কি না জানিনে। এখন তো নয়।

কমিউনিস্টরা রুশ চীনে অসাধ্য সাধন করেছে, কিন্তু প্রাণ খুলে তাদের আশীর্বাদ করতে পারছিনে, কেননা তারা হিংসার জন্য একটুও অনুতপ্ত নয়, মিথ্যার জন্যে একটুও লজ্জিত নয়। তা বলে তাদের অভিশাপ দিতে পারব না, ধ্বংস করতে বলব না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা তাদের কীর্তির উপর পরমাণু বোমা ফেলা আমার সমর্থন পাবে না।

তোমার পত্রিকা চোখে দেখিনি। তোমাদের পলিসি না জেনে উপদেষ্টামণ্ডলীতে যোগ দেওয়া ঠিক হবে না। আমার কাছে কী উপদেশ চাও, সে উপদেশ পালন করবে কি না এসব আমার জানা চাই। আমার মনে হয় ও সবের দরকার নেই। আমাকে বা আর

কাউকে উপদেষ্টা বলে ঘোষণা করে ফল যা আশা করছ তা পাবে না। গ্রাহক অন্য জিনিস চায়।

স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভার্থী
অন্নদাশঙ্কর রায়

পত্র : ২

শান্তিনিকেতন
২৫.১.৫২

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমাকে কয়েকখানা চিঠির জবাব একসঙ্গে দিচ্ছি। যে ফোটোখানা পাঠাচ্ছি সেখানা এক ভদ্রলোক মেলার সময় তুলেছিলেন, আমার ও প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ের একসঙ্গে। হাতের কাছে আর কোনো ফোটো নেই।

না, আমি গান গাইতে পারিনে। সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ আমি লিখিনি, সে বিষয়ে আমি অজ্ঞ। আমার পরবর্তী উপন্যাস পর্যায়ের পটভূমি সম্বন্ধে চিন্তা করছি। ইচ্ছা ছিল পটভূমি হবে ত্রিশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু খুব সম্ভব কোনো রকম পটভূমি থাকবে না।

বিপ্লব ঘটে যখন অগ্রসর হওয়ার আর সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। হিরণ্যশিপুর মতো যারা ভাবে তারা সবাইকে মারবে কিন্তু তাদের কেউ মারতে পারে না, তারা সব পথঘাট বন্ধ করে রেখেছে, নৃসিংহ অবতারের মতো কোনখান থেকে বিপ্লব আসে তাদের নিপাত করতে। আসে অকস্মাৎ। যখন আসে তার আধ ঘন্টা আগেও কেউ জানে না। বিপ্লবীরা নিজেরাই জানে না।

বিপ্লব যে সফল হবেই এমন কোনো কথা নেই। হিরণ্যকশিপু গেলেও দানব বংশ অত সহজে যাবার নয়। প্রতিবিপ্লবও ঘটে। অনেক সময় প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে বল কষাকষি করতে করতে বিপ্লবের অন্তঃসার উবে যায়। রাশিয়ায় যা আছে তা বিপ্লবের সার নয়। লেনিনের সঙ্গে সঙ্গে সেটা গেছে। রাশিয়া ও বিপ্লব সমার্থক নয়।

রুশের সমাজব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার পর ঠিক কী পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে বলা শক্ত। ওদের কৃষি পদ্ধতি অচল। কৃষকরা ওতে সুখী বা সন্তুষ্ট হতে পারে না। কেবল শ্রমিকের বা নাগরিকের স্বার্থে রাষ্ট্র চালাতে গেলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এদেশেও কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে কলকাতার ও industrial area-র পেষণে। রাশিয়া যদি সতর্ক হয়, তার সমাজব্যবস্থার এই দুর্বলতা সময় থাকতে যদি সারায়,

তবে তাকে বহু পরিমাণে decentralise করতে হবে। তখন সে ব্যবস্থা প্রায় গান্ধীবাদী ব্যবস্থার কাছাকাছি যাবে।

না, উদ্দেশ্য মুখ্য ও উপায় গৌণ নয়। উপায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্কটকালে উদ্দেশ্য মুখ্য হতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে উপায়ও মুখ্য হতে পারে।

Jan christophe আমার জীবনে প্রভাব রেখে গেছে।

"দু'কান কাটা" আমার নিজের বিচারে সেরা গল্প। কবে আবার অমন একটা গল্প লিখতে পারব বিধাতা জানেন। "হাসন সখী" ওর সমগোত্রের।

আশা করি পরীক্ষার পড়া জোর চলছে। স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর রায়

পত্র : ৩

শান্তিনিকেতন,
২৪.১০.৫৪

স্নেহের সুরজিৎ,

কাল রাত্রে বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলুম। যত দিন না "রত্ন ও শ্রীমতী" শেষ হচ্ছে তত দিন অন্য কোনো কাজ হাতে নেব না– ব্যতিক্রম কেবল কবিতা, ছোটগল্প ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ (সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রবন্ধ নয়)। সাত আট বছর এইভাবে চলবে।

তার পরে আমার প্রধান বাহন হবে কবিতা বা কাব্যনাট্য। ও ছাড়া আর যা হাতে নেব তা ছোটগল্প, সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও বিনুর বই দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ড।

"গান্ধী" সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখলুম যে ও বই "রত্ন ও শ্রীমতী"র সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে পারে না। যদি লিখতেই হয় তবে পরবর্তী বয়সে। লিখবই যে এমন কোনো জেদ আমার নেই। যদি আর কেউ লিখতে রাজী হন ও আমার সাহায্য চান তা হলে সেই হবে সব চেয়ে ভালো। তা না হলে আমাকেই লিখতে হবে, কিন্তু আপাতত সাত আট বছর নয়, তার পরে রয়ে সয়ে, কাব্যের ফাঁকে ফাঁকে।

কবিতার উপর টান আমার বাল্যকাল থেকেই। একদিন আমি কবি ছিলুম। এখন যে কেউ আমাকে কবির পর্যায়ে ফেলে না, বড় জোর ছড়ার জন্যে স্মরণ করে, এটা আমার জীবনের অন্যতম আফসোস। কিন্তু এখনো আমার কাব্যে ফিরে যাবার সময় আসেনি, আমাকে উপন্যাসের রাজ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করতে হবে। তা ছাড়া কবিতা লিখতে বসলেই তো লেখা আপনি আসবে না, কবিতার যা আবশ্যকীয় গুণ– স্বতঃস্ফূর্তি বা

abandan– তা বহু ভাগ্যে আসে। তার জন্যে সবুর করব, মাঝে মাঝে দুটো একটা লিখব। তবে গোটা তিনেক বা চারেক বড় কবিতা লেখার পরিকল্পনা আছে, তাতে থাকবে আমার জীবনদর্শন বা "নিশ্চিতি"। বলতে পারো আমার Book of Faith বা affirmations. এরজন্যে কিছুমাত্র ত্বরা নেই। উপন্যাসটা আগে। বিশ বছরের পুরোনো এনগেজমেন্ট।

দেখতেই পাচ্ছ এসব ভাবনার সঙ্গে তোমার সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা– dictatorship না অন্য কিছু– একেবারে বেখাপ। এসব জিজ্ঞাসার উত্তর কেউ তোমাকে দিতে পারে না। Aristotleএর সময় থেকে লোকে এই নিয়ে তর্ক করে আসছে। তবে এইটুকু তোমাকে বলতে পারি। Ballot boxএর নিরাপত্তায় dictatorship হবে না, তার জন্যে bullet লাগবে। যারা মরতে ভয় পায় তারা dictatorshipএর স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন কখনো সত্য হবে না। সেরে ওঠো। স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর রায়

Nature তোমাকে warning দিয়েছে। সে warning মাথার উপর ঝুলছে।

পত্র : ৪

শান্তিনিকেতন
২৫.১.৫৫

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার চিঠি পেলুম। আমি প্রথমেই স্থির করি যে কারো মন-রাখা কথা বলব না, আমার যা বক্তব্য তা অকপটে ব্যক্ত করব। যার ভালো লাগে লাগবে, যার না লাগে না লাগবে। সাহিত্য সম্বন্ধে যিনিই যাই বলুন না কেন মতভেদের অবকাশ থাকবেই। এ তো বিজ্ঞান নয় গণিত নয় যে সকলে একমত হতে বাধ্য। এর মূল্য সর্বজনের স্বীকৃতিতে নয়, এর মূল্য আমার অভিজ্ঞতার যাথার্থ্যে, আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তায়। দীর্ঘ সাধনার দ্বারা বেশী না হোক একটুখানি প্রামাণিকতা (authority) তো অর্জন করেছি। এর মূল্য আমার প্রামাণিকতায়। "সঙ্কট" নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছি। এবার "রত্ন ও শ্রীমতী"র জন্যে মন ব্যাকুল। অথচ আরো দু'একটা ছোটখাটো কাজ হাতে রয়েছে। আশা করি তোমার শরীরের যত্ন নিচ্ছ। এই শীতকালটা ভালো করে রোদ পোহানো চাই। তেল মেখে রোদে পড়ে থাকবে। স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর রায়

পত্র : ৫

শান্তিনিকেতন, ১৫/৬/৫৫

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার চিঠি ও "দীপিকা" পেয়েছি। প্রবন্ধটি ভালোই হয়েছে। আশা কোরো না যে তোমার শেষ সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হব। একটা কথা আমার বিশ্রী লেগেছে। Concerbine শব্দটা ওখানে খাটে না। গ্যয়টের অন্য একজন সহধর্মিনী থাকলে Christianaকে "concerbine" বলা চলত। কিন্তু গ্যয়টে আর কাউকে বিয়ে করেন নি– আগেও না, পরেও না। ইউরোপে এরূপ স্থলে বলা হয় 'Common Law Wife' অর্থাৎ লোকাচারসম্মত পত্নী। উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী বিবাহ তখনকার দিনে অচিন্তনীয় ছিল। নইলে তাঁদের আইনতঃ বিবাহে কোনো বাধা ছিল না। তাছাড়া সেকালে civil marriage প্রচলিত হয়নি, গির্জায় গিয়ে বিয়ে করতে গ্যয়টের আপত্তি ছিল। তিনি nutralism-এর বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্যয়টে-সঙ্গিনীকে "Concerbine" বলেননি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। তুমি কি ইতিহাস সৃষ্টি করবে?

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভেবে দেখেছি, তাঁকে liberal বলা চলে না, কিন্তু humanist বলা চলে। তা যদি বলো তবে মধ্যযুগীয় বলা অযৌক্তিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে সব ধর্মগ্রন্থ লিখেছেন তার কোনোটিতে পূর্বসূরীদের authority মেনে নেননি। স্বাধীন মত দিয়েছেন। মধ্যযুগে এটা অসম্ভব ছিল। এ শুধু আধুনিক যুগেই সম্ভব। বঙ্কিমের উপন্যাসের অধিকাংশ নায়কনায়িকা কায়স্থ কিংবা রাজপুত। ব্রাহ্মণ বড় একটা দেখিনে, যাদের দেখি তারা 'superior' নয়। বরং শরৎচন্দ্রের লেখায় বামুন ও বামনীই বেশী। ছোটলোকও বড় একটা নেই। থাকলেও 'inferior' নয়। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য তাঁর লেখায় উঁকি মারছে না। তবে সন্ন্যাসীকে তিনি বড় ভক্তি করতেন। জ্যোতিষ মানতেন। জানতেন না যে ওটা গ্রীস থেকে আমদানি। ভারতের নয়। হিন্দুরও নয়। মুসলমানের অত্যাচারে তিনি বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল। এত রকম মুসলমান চরিত্র কোনো মুসলমানও আঁকেন নি। আত্মসম্মানবোধ থেকে তিনি ইংরেজের উপর বিরূপ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্য থেকে দু'হাতে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছেন। উপন্যাসের বেলা ইংরেজের লেখা ইতিহাস ও Tod এর লেখা "রাজস্থান" তাঁর সম্বল। দেশী পুঁথি নয়। তাঁর মূল্যবোধ মোটের উপর পশ্চিমমুখী ছিল। এক বিধবাবিবাহ ভিন্ন তাঁর সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সংস্কারকদের তেমন কোনো মতবিরোধ ছিল না। বহুবিবাহের ছবি তিনি এঁকেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে। আধুনিক উপন্যাসে বহুবিবাহের বিরুদ্ধতা করেছেন। মূর্তিপূজা নিয়ে কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। রামকৃষ্ণভক্ত ছিলেন না।

মধ্যযুগীয় হিন্দু গোঁড়ামি এলো বঙ্কিমের পরে– বঙ্কিমকে সামনে রেখে। এর জন্যে বঙ্কিমের দায়িত্ব বেশী নয়। বঙ্কিমকে যারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে তারাই দায়ী।

তোমার লেখায় ও চিঠিপত্রে এত বেশী Marx Engles ইত্যাদি থাকে যে তোমাকে Marxist ভেবে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে জড়িয়ে "তোমরা" বলা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে তুমি যখন offence নিচ্ছ তখন "তোমরা" প্রত্যাহার করলুম।

আমার ও-গল্প লেখার সময় Thekerএর কথা মনে ছিল না, কোনো সম্বন্ধ নেই 'Darling'এর সঙ্গে। ওটা বাউল থেকে পাওয়া ভাবের উপর কল্পনা ফলানো।

নন্দু এইখানেই I.Sc. পড়বে। তোমার অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ। স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর রায়

পত্র : ৬

শান্তিনিকেতন
২৩/১০/৫৮

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার পোস্টকার্ড পেয়ে কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছিনে। "অজ্ঞাতবাসে"র প্রুফ দেখা কি শেষ? কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে লিখো। আমার কলকাতা যাওয়া এ সপ্তাহে হবে না। গেলে পরের সপ্তাহে যাব। তখন দেখা হবে।

ইতিমধ্যে আমার শ্বশুর মহাশয় দেহত্যাগ করেছেন। সোমবার ঘটনা। খবর এলো মঙ্গলবার। শ্বশুরকন্যা শোককাতর। আজ আমাদের বিয়ের সাম্বৎসরিক। নিরানন্দ। ঠিক এমনি নিরানন্দ ঘটেছিল বিয়ের এক বছর পরে। সেবারে আমার বড় সম্বন্ধীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এ বছর আমাদের দিন ভালো যাচ্ছে না। তবু তারই মধ্যে দুটো একটা সৌভাগ্যের ভরসাও মিলেছে।

পুণ্য কলকাতা ছাড়ছে রবিবার রাত্রে Puri Expressএ। যদি দেখা করতে চাও রবিবার খোঁজ নিয়ো। পুণ্যর মা বোধ হয় তার আগেই ফিরে থাকবেন। নন্দুকে একা রেখে এসেছেন।

শারদীয়ার (বিজয়ার) স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ৭

শান্তিনিকেতন
২৯/১১/৫৮

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার দু'খানি পোস্টকার্ড পেয়েছি। তোমার কালীবাড়ি যাত্রার বর্ণনা রোমাঞ্চকর।

আমার আর রাজনীতি নিয়ে লিখতে রুচি নেই। এ যা লিখলুম এটা আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। বেশ কয়েক বছর আগ বাড়িয়ে ভেবে নিলুম। শিল্পীকে সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। এও একপ্রকার প্রস্তুতি। তবে আমার আসল প্রস্তুতিটা negative নয়, positive, অর্থাৎ রাজনীতিকদের উপর নির্ভর করে না, আপনার উপর নির্ভর। দেশ রসাতলে গেলেও আমি রসের অতলে ডুবে থাকব, রস পান করে ও পান করিয়ে আমার সার্থকতা ও সিদ্ধি।

পাস্তেরনাক সম্বন্ধে কিছু লিখতে চেষ্টা করলুম। পছন্দ হলো না। ফেলে রেখেছি। আরো দু'একটা ছড়ার খসড়া তৈরি করছি। "আর্টে"র কথাও ভাবছি।

কাজের মতো কাজ হচ্ছে না বলে মনে মনে অশান্তি বোধ করছি। একটা গল্প যদি কোনো মতে হাত দিয়ে বেরিয়ে যায় শান্তি পাব।

স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ৮

শান্তিনিকেতন
৯/৩/৫৯

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার পর পর কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। "দেশ"-এ আমার জন্মদিন উপলক্ষে বিজ্ঞাপনও দেখেছি। তোমাকে পরে বড় চিঠি লিখব। আমার খবর সংক্ষেপে এই যে "রত্ন ও শ্রীমতী"র পুরোনো নোটখাতা সমস্ত পুড়িয়ে ফেলেছি। তার মধ্যে ২৫ বছরের পুরোনো খাতাও ছিল। আর ও বই লেখা হবে না। এই সিদ্ধান্ত নিতে আমার কত সংগ্রাম করতে হয়েছে তা পরে একদিন শুনবে। নতুন একটা বড় উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছি। আস্তে আস্তে লেখা যাবে। আট দশ বছর লাগবে। সেই গল্পটা (যেটার কথা তোমাকে বলেছি) হাতে রেখেছি। তার আগে আর একটা লিখে "আনন্দবাজারে" দিতে চাই। কিছুতেই পারছিনে। আজ আবার চেষ্টা করব।

তোমার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে শুনে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু আশঙ্কাও হচ্ছে যে তুমি হয়তো অধীর হয়ে অনিয়ম করবে। স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ৯

শান্তিনিকেতন
৩০/৩/৬১

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার পোস্টকার্ড পেয়েছি। তুমি কেন কষ্ট করে অত দূর এসে ফিরে গেলে? কাগজ তো আমার হাতেই দিয়েছিলে। সেদিন আমি গোপালদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে সাড়ে আটটায় বেরোই প্রথমে যাই ঘোষ লেনের বাড়ীতে। শুনি তিনি দোকানে। তার পর দোকানে যাই। দেখা করে দুটো কথা বলে অমনি শেয়ালদা ছুটি। তোমাকে সেখানে প্রত্যাশা করেছিলুম এমনি অকারণে।

এখানে পৌঁছে বেশ ক্লান্ত বোধ করছি। এখনো লেখায় মন দিতে পারিনি। "Materialism" সম্বন্ধে অনুরোধ পাচ্ছি বিভিন্ন সূত্র থেকে। কিন্তু আপাতত ও কথা ভাবছিনে। ইতিমধ্যে একদিন অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল এসেছিলেন অন্য কাজে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হলো। আমি বোধ হয় এ বিষয়ে অপাত্র। আমার বোধ হয় লেখা উচিত নয়। কারণ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে লিখতে হলে বিভিন্ন ধর্ম মত ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার। এটা এমন একটা complex ব্যাপার যে কেউ আমাকে দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে নেই। আমাকেই যদি সব খুঁজে পেতে বার করতে হয় তবে সময় নিতে হয়। গবেষণা করতে হয়। কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব?

যা হোক মনে মনে একটা খসড়া তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাকেই লিখতে হবে যথাসম্ভব সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে। ইটালী থেকে ওরা এখনো তাগাদা দেয়নি। দিলে বড়দিন পর্যন্ত সময় চাইব। "প্রবাসী"র জন্যে যে উপন্যাস লিখতে হবে সেটা ইতিমধ্যে শেষ হবে কি না সন্দেহ। ওঁরা আশা করছেন বড়দিনের মধ্যে। মাঝখানে পূজা পড়ছে। গল্প লিখতে হবে।

প্রবন্ধ সঙ্কলন ও কবিতা সঙ্কলন দু'খানাই এইবার তৈরি করে ছাপতে দেব। ২২শে এপ্রিল আমার সঙ্গে দেখা হলে অন্তত একখানার সূচী পাবে। ইতিমধ্যে যেটুকু পারো কাজ এগিয়ে রেখো। তা [...] তোমার পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি করে নয়। আমার এ গ্রন্থ সবুর করতে পারে।

পুরস্কার? ছি ছি! আমার নামেও লোকে কু কথা রটায়। Official careerটাই সাহিত্যের জন্যে ত্যাগ করলুম। চাকরিতে থাকলে কত লক্ষ টাকা রোজগার করতুম। আমার কাছে তুচ্ছ ৫০০০্ টাকার পুরস্কার! ১০০০্ টাকা তো দশ-বারো দিনের আয় ছিল আমার। আর recognition আমার কিসের কম যে পুরস্কার না পেলে পূর্ণ হবে না? এ সবই আমি এক এক করে বিসর্জন দিচ্ছি। না দিলে শক্তি পাব না। শক্তি না পেলে সাহসের সঙ্গে কঠিন কথা শোনাতে পারব না। যে কাজের জন্যে আমি জন্মেছি।

গত রাত্রে শুতে গেলুম বারোটায়। তার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলুম। "রত্ন ও শ্রীমতী"র অন্যান্য [অংশ] লিখব না, এ সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলুম। কিন্তু সেই মালমশলা নিয়ে অন্য বই লিখব এ কল্পনা ছিল, এটাও ত্যাগ করলুম। অর্থাৎ খোল ও নলচে দুই গেল। এবার আমি দায়মুক্ত। জীবনে সব মালমশলা কাজে লাগানো যায় না। যেটুকু লাগবে সেটুকু যেন নিখুঁৎ ভাবে লাগাতে পারি।

জীবনদেবতার সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা বোঝাপড়া হচ্ছে। আমি কী কী ছাড়ছি দেখলে তিনি সেই অনুসারে দান করবেন। আমার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে তাঁর সিদ্ধান্ত। যেমন তোমার সিদ্ধান্তের উপর তোমার মায়ের সিদ্ধান্ত।

স্নেহ জেনো। গোপালদাসবাবুর Mont Blanc কলমে লিখছি। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ১০

শান্তিনিকেতন
২৬/৬/৬১ বিকেল

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমাকে কাল সকালে একখানা ও কাল বিকেলে একখানা – দু'খানা চিঠি লিখে ডাকে দেবার সময় আজ সকালে আমার প্ল্যান আবার বদলাল। তাই তোমাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে এ দু'খানি চিঠি আটক করলুম। দ্বিতীয় চিঠিখানি এখন rewrite করছি। প্রথম খানার সামান্য পরিবর্তন করলেই চলবে।

"রবীন্দ্রনাথ" বলে একখানা আলাদা প্রবন্ধের বই এই শতবার্ষিকীর বছরই বেরোবে। সম্ভব হলে পূজার সময়। নয়তো বড়দিনের সময়। এতে কী কী যাবে তার একটি ফিরিস্তি তোমার জন্যে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। বইখানি মোটামুটি "কণ্ঠস্বরের" মতো হবে। সেই প্রেসে ছাপানোর চেষ্টা করতে গোপালবাবুকে লিখলুম। অবশ্য তিনি যদি আমার এ বই প্রকাশ করতে রাজী থাকেন। এটি প্রকাশ করলে প্রবন্ধ সঙ্কলনের দ্বিতীয় অংশ থেকে কতক প্রবন্ধ বাদ যাবে। সেই প্রবন্ধগুলি একবার "রবীন্দ্রনাথ" ও একবার প্রবন্ধ

সঙ্কলনে মুদ্রিত হলে কি পাঠকরা দোষ দেবেন বা বিক্রীর দিক থেকে অসুবিধে হবে? প্রবন্ধ সঙ্কলন থেকে বাদ গেলে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ "রবীন্দ্রনাথ" নামে যে বইখানি বেরোবে তাতে তো সেগুলি থাকবে ও সহজলভ্য হবে। অথচ সেগুলি বাদ দিয়ে "রবীন্দ্রনাথ" কল্পনা করা যায় না। বিশেষত "বিনুর সাক্ষ্য" বলে সেই বিশিষ্ট প্রবন্ধটি। আমি তো ভেবেছিলুম বইখানার নাম রাখব তারই নামে। "রবীন্দ্রনাথ : বিনুর সাক্ষ্য" কি খুব খারাপ শোনায়? গৃহিণী কিন্তু বলেন ও নাম চলবে না। তাই শুধু "রবীন্দ্রনাথ" নাম রাখছি। তুমি কী বল?

সেই যে "শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী" সেটি ও তুমি যেটির নকল তৈরি করেছিলে– "রক্তকরবীর তিনজন" ও দুটি রচনাও "রবীন্দ্রনাথে"র অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজন হিসাবে। তোমার কী মত? যদি তা না হয় তবে দুটোকেই প্রবন্ধ সঙ্কলনের সংযোজনে দেওয়া যাবে। কাল তোমাকে যে লিখেছি প্রথম খণ্ডে "জীবিকা"র জায়গায় বসিয়ে দিতে সেকথা প্রত্যাহার করছি। প্রথম খণ্ড যেমন গেছে যাক। দ্বিতীয় খণ্ড তৈরি করার সময় সিদ্ধান্ত নিতে হবে রবীন্দ্রবিষয়ক রচনা আবার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা। তৃতীয় খণ্ডের জন্যে ও সংযোজনের জন্যে কতক পুরোনো লেখা আমি জোগাড় করেছি। কলকাতা গেলে হাতে হাতে দেব।

স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

কবিতা সঙ্কলন ও নতুন ছড়ার বই পুজোর পরে তৈরি করতে বসব। "আর্ট"ও এই বছর লেখা শেষ হবে। "জীয়নকাটি" কাল মাসিমার হাতে পাঠাচ্ছি।

পত্র : ১১

শান্তিনিকেতন, ৫/৭/৬১

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার দু'খানা চিঠি পর পর পেয়েছি। তুমি তোমার সুবিধামতো একদিন গিয়ে "জীয়নকাটি" নিয়ে আসবে। ওটার দরকার "কথা"র দ্বিতীয় খণ্ডের copy তৈরি করার জন্যে। তার যদি দেরি থাকে তা হলে শুধু ওটার জন্যে অতদূর যেতে হবে না, আমার উচিত ছিল ওটা ডাকে পাঠানো।

গীতু-বাপ্পার যাত্রার ব্যবস্থা পাকা হয়নি। হবে এ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে। সে সময় মাসিমা আবার কলকাতা যাবেন। তারপর গীতু-বাপ্পাকে প্লেনে তুলে দেবার সময় আমিও যাব– বোধ হয় ৭ই আগস্ট। তোমার পরীক্ষা তো ১৬ আগস্ট। তোমার উপর এবার আর কোনো বোঝা চাপাব না। পরীক্ষাটা ভালোয় ভালোয় শেষ হোক।

আর ওই "রবীন্দ্রনাথ" নামক প্রবন্ধের বইয়ের মাত্র তিনটি প্রবন্ধ তোমার হাতে। আরো তিন চারটে আমার মাথায়। যদি এই মাসে লিখে ফেলি তা হলে গল্প লেখা পেছিয়ে যাবে। গল্প লেখার ফাঁকে ফাঁকে লিখতে চাই। সুতরাং আগস্টের শেষের দিকেই সব ক'টা তোমাকে পাঠাতে পারা যাবে। তার আগে নয়। ইতিমধ্যে যদি "তাঁর পরেই প্লাবন" ইত্যাদি তিনটে প্রবন্ধ প্রেসে দিলে কাজ এগিয়ে থাকে তা হলে একদিন দিয়ে আসতে পারো। কিন্তু শুধু এই জন্যে বাড়ীর বাইরে যেতে হবে না।

তারপর "কথা"র প্রবন্ধগুলো। প্রথম খণ্ড থেকে যদি "জীবিকা" ও "জনসংখ্যা" বাদ দিতে চাও তা হলে পরে যেদিন ওদিকে যাবে সেদিন বাদ দেবে। আমার তো মনে হয় না যে ওরা "রত্ন ও শ্রীমতী" শেষ না করে "কথা"য় হাত দেবে। "কথা"র প্রুফ আমি দেখব।

"কথা"র দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে যখন copy তৈরি করার সময় আসবে তোমার পরীক্ষার পরে, তখন তাতে "রবীন্দ্রনাথের অপরাধ" যাবে "রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ে"র পরে। তার পর তৃতীয় খণ্ডের জন্যে তোমাকে কিছু লেখা আমি কলকাতায় দিয়ে আসব। তারপর সংযোজনের জন্যেও তোমাকে কিছু লেখা দিয়ে আসব। সেই সংযোজন অংশেই যাবে "রক্তকরবী"। আর "শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী" তুমি ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় খণ্ডে দিতে পারো "রবীন্দ্রাদিত্যে"র পরে কিংবা "জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথে"র আগে। আমার মনে হয় সংযোজনে না দিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়াই ভালো।

"রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তা বিলোপ করব। নববিধানীদের version আমি পড়িনি। পড়েছি প্রতিপক্ষের version. তোমার কাছে নববিধানের version থাকলে রেখে দিয়ো আমার জন্যে। "গোরা" লিখতে লিখতে অন্য রকম হয়েছে। নিবেদিতা না বললে রবীন্দ্রনাথ সুচরিতার সঙ্গে গোরার বিয়ে দিতেন না। কোন ভারতীয়ার সঙ্গে না। তবে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু পুনরুজ্জীবন পর্যায় ঠিক কবে শেষ হলো বলা শক্ত। "গোরা"র আগে পর্যন্ত তার ছাপ পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে লিখব না। Dangerous! আপাতত আমার নিজের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে লিখতে চাই– উপন্যাস। কবিতা? আরো দেরি হবে।

হেমিংওয়ের মৃত্যু তাঁর উপযুক্ত হয়েছে। তবু আমি দুঃখিত। তুমি পরীক্ষার পর ওঁর সম্বন্ধে লিখতে পারো। আপাতত পরীক্ষার জন্যে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় কর। কুশলের উপর ছড়া লেখা শুরু হয়ে গেছে। স্নেহ জেনো। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ১২

শান্তিনিকেতন
১৯/১২/৬১

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছিলুম। আরো একখানা পেয়ে আরো সুখী হলুম। বেশী চলাফেরা কোরো না। একটানা বিশ্রামও চিকিৎসার অঙ্গ। তোমার বন্ধুদের বলবে তোমার ওখানে গিয়ে আড্ডা দিতে। ওদের আড্ডায় তুমি যেয়ো না। আমি জানি আড্ডাও তোমার অপরিহার্য প্রয়োজন। কিন্তু এবার একটু পড়াশুনাতেও মন দেওয়া দরকার। আর কিছু না হোক মঞ্জুর খাতিরে। তা ছাড়া চাকরিও তো একটা চাই। সেটার উপরেও নজর রাখতে হবে।

আমি এখন কী নিয়ে ডুবে আছি শুনলে হাসবে। "Statesman" থেকে ওরা চেয়েছে ইংরেজী প্রবন্ধ। বিষয় suggest করেছে আমার I.C.S.এর দিনগুলি। আমি লিখলুম, "তোমরা censor করবে না তো?" ওরা উত্তর দিল, "ধাঁধায় ফেললেন। লেখা আমরা censor করিনে। তবু একবার চোখে না দেখে বলতে পারছিনে।" এখন লিখছি রোজ সারা দিন ও সন্ধ্যা। দেখি কী রকম দাঁড়ায়। Republic Dayতে বেরোবে।

মাঝখানে আমার রক্তের চাপ বেড়েছিল। হাঁটতে গেলেই মাথা ঘুরত। মাতালের মতো টলতে টলতে বেড়াতুম। না বেড়ালেও ঘুম হতো না। গৃহিণী বিষম চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। বার বার রক্তের চাপ পরীক্ষার এই কাল ডাক্তারবাবু রায় দিলেন, "মাথা ঘোরার কারণ blood pressure নয়। আবার নুন খেতে পারেন।" রক্তের চাপ স্বাভাবিক, কিন্তু চিন্তার চাপ অস্বাভাবিক সেই পুজোর আগে থেকে। "রবীন্দ্রনাথ" প্রায় শেষ। আরো কবিতা হাতে জমেছে। কিন্তু তুমি যা দিয়ে এসেছিলে তারই প্রুফ আজো এলো না। ছাপাখানা বোধ হয় পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ব্যাপৃত।

আচ্ছা, প্রুফ দেখতে দেব তোমাকে। "দেশে" আমার "ভারতীয় সংস্কৃতি" পড়েছ? (২রা ডিসেম্বর সংখ্যা)। ওটা নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। প্রশংসাও শুনছি।

আমি প্রশংসার জন্যে লিখিনে। সুযোগ পেলেই আঘাত হানি। ওটা আমার বরাবরের অভ্যাস। নারায়ণবাবুর রক্ষণশীল "ভারতীয়" (= গোঁড়া হিন্দু) মন আমার সংস্কারমুক্ত ভারতীয় (="ইউরোপীয়") মনকে ভুল বুঝবে ও বোঝাবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? তবু ব্যথা পেয়েছি এইজন্যে যে তিনি আমাকে সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির সঙ্গে জড়িয়ে "সংখ্যালঘুর" কোটায় তো ফেলেছেনই, "minority-faiting" করেছেন। অর্থাৎ "সংখ্যালঘু"দের অস্তিত্বটাই তাঁর চক্ষুঃশূল। এমন অভিসন্ধিও আরোপ করেছেন যে আমাদের সত্যবোধ আমাদের স্বার্থচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন। এবং

সমস্তটাই বিদেশের মোহে। বিদেশের মুদ্রায় যে বলেননি এর জন্যে তাঁকে প্রণাম। স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ১৩

শান্তিনিকেতন
২৩/১০/৬২

স্নেহের সুরজিৎ,

তোমার ও মঞ্জুর চিঠি ও কার্ড পেয়ে খুশি হয়েছি। তোমরা ওখানে গিয়ে আনন্দে আছো তা জেনে আমিও আনন্দভাগী।

আজ আমাদের বিয়ের ৩২ বছর পুরো হলো। এতখানি পথ অতিক্রম করতে তোমাদের ৩১ বছর কয়েক মাস লাগবে।

চিন্তাটা এখনো সাহিত্যমুখী হয়নি। কিন্তু হবে মনে হচ্ছে। আপাতত চিঠিপত্র লিখছি, বইপত্র ঘাঁটছি। কাল শঙ্করের "চৌরঙ্গী" পড়লুম। তোমার বই হাতের কাছে রেখেছি। পড়ব।

"চৌরঙ্গী" তো আজকাল খুব বাজার চলতি বই। শঙ্করের sale আমার সুপারিশের অপেক্ষা রাখে না। বইখানি উপহার পাঠিয়েছেন কেন তা হলে? বোধ হয় বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারের জন্যে। (আশা করি পুরস্কার প্রত্যাশায় নয়।)

ভাবছি কী তাঁকে লিখব। বইখানিতে অনেকগুলি মুখ, কিন্তু মুখের পেছনে যে মন সে মন একটুখানি ঘোমটা সরায় শুধু। অল্পই তার দেখতে পাই। তারপর আবার ঘোমটা দেয়। একজন মানুষের পক্ষে অতগুলি মনের অন্তরঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়। শঙ্কর অন্তরঙ্গ হতে সময় পান নি। বোধ হয় দুরাশা বলে চেষ্টাই করেন নি। সেইজন্যে অনেকগুলি character পাওয়া যায়, কিন্তু এক একজনের একটিমাত্র দিক বা aspect. ক্বচিৎ কখনো আরেকটা দিক। সেটাতে বাঁচিয়ে দেয়। মোটের উপর তিনি মানবদরদী, humanist. সেইজন্যে তাঁকে আমার ভালো লাগে। সাফল্য বা সংসার তাঁকে নষ্ট করেনি। আশার কথা।

তুমি তো জানো মেলার সময় এখানে কেমন ভিড় হয়। মেলার দু'তিন সপ্তাহ থেকে লোক আসতে আরম্ভ করে। বাড়ীর মালিকরা অনেক বেশী আদায় করে নেন। মাস হিসেবে না দিয়ে দিন হিসেবে ভাড়া দেন। মাস হিসেবে যেখানে ৫০ টাকা লাগত দিন হিসেবে সেখানে তিনগুণ লেগে যায়। কাজেই এখানে আসতে হলে ডিসেম্বরে এসো না। মঞ্জুকে এ কথা বলবে। সে ডিসেম্বরে আসতে চায়।

প্রবন্ধ সঙ্কলনের পাত্তা নেই। তুমি নভেম্বরে ফিরলে একবার খোঁজ নিয়ো।

আমাদের স্নেহ জেনো দু'জনে। দাদাকে ও শম্ভুবাবুকে প্রীতিনমস্কার। ছোটদেরকে স্নেহ। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ১৪

অন্নদাশঙ্কর রায়

শান্তিনিকেতন
২৪/১/৬৪

স্নেহের সুরজিৎ ও মঞ্জু,

তোমাদের গৃহপ্রবেশ আনন্দের হোক। সুরজিৎ যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে আমি সুখী হয়েছি। কলকাতা গেলে তোমাদের দেখা পাওয়া সহজ হবে। আমাকে বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Convocationএ নিমন্ত্রণ করবে। "সুখ"এর জন্যে পুরস্কার গ্রহণ করতে। ভাবছি যাব।

এদিকে লেখার দেখা নেই। মনটা অশান্ত। ক্রমে স্থির হয়ে আসছে। কোনো ক্ষতিই ক্ষতি নয় যদি তার থেকে লাভ উঠিয়ে নেয়ার কৌশল জানা থাকে। দেখবে ভারত এর থেকে লাভবান হবে।

মঞ্জুকে আপাতত তার মতবাদের মধ্যে অপ্রিয় হতে হবে। কিন্তু পরে আবার [অনেকেই] ওর সাথে একমত হবে। 'ড্রাগনের দাঁতে'র জন্যে আমাকে কী পোহাতে হয়েছিল? সুধীন ঘোষের জন্যে এখনো দুর্ভোগের ইতি হয়নি। তবু লোকে আমার দিকেই আসছে। যা right তারই জয় হবে।

স্নেহ জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর

পত্র : ১৫

২৩৩ যোধপুর পার্ক
কলকাতা-৩১
১৮/১০/৬৮

স্নেহের সুরজিৎ,

বেজবরুয়া জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে আসামের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ফিরে তোমার চিঠি পেয়ে পরম আশ্বস্ত হলুম। তোমরা নিরাপদে আছ, তোমার মা

নিরাপদে আছেন, তোমার দাদা বৌদিও নিরাপদ (যদিও কোথায় আছেন জানা নেই)– এ সব খবর শোনার জন্যে আমি আসাম সফরের সময় বেশ উদ্বেগ বোধ করছিলুম। বিশেষ করে তোমার মার জন্যেই ভাবনা ছিল বেশী। তোমার মাসিমার কথা লেখনি। আশা করি তিনিও নিরাপদে আছেন।

আসাম সফর খুব ভালো লেগেছে। এমন স্বতঃস্ফূর্ত সানুরাগ সম্বর্ধনা আর কোথাও পাইনি। চোখে জল এসে গেল। লিখেছিলুম ওই একটি প্রবন্ধ– "ড্রাগনের দাঁত"। তার থেকেই এত। একটি লেখার পুরস্কার কেউ কখনো এমন ব্যাপকভাবে পেয়েছে কি?

ভাবছি আসামযাত্রার উপর একটি প্রবন্ধ লিখব। অনেক কথা বলবার আছে। আসামের লোক আমাদের থেকে কতক বিষয়ে ভিন্ন। প্রবন্ধটার নাম রাখতে চাই (বেজবরুয়ার গান থেকে) "অ' মোর আপোনার দেশ" কিংবা "অ' মোর চিকুণী দেশ"। (চিকুণী কথাটার মানে জানো? আন্দাজ করো। বলব না।) শুধু বল কেমন শোনায়।

তোমার ইংরেজী প্রবন্ধ পেয়েছি। কয়েক লাইন পড়েছি। পরে পড়ব।

তোমরা কবে কলকাতা আসছ?

একটু জিরিয়ে নিয়ে 'গান্ধী' লিখতে বসব। আপাতত আর কোনো বই না। তবে খুচরো লেখা কয়েকটা লিখতে হবে। "আর্টে"র শেষ অধ্যায় বাকী।

বিজয়ার স্নেহ ও শুভকামনা জেনো তোমরা। তোমার মাকে বিজয়ার প্রীতি নমস্কার। তাঁর যে গুরুতর ক্ষতি হলো তার জন্যে তাঁকে সমবেদনা জানিয়ো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর